Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 17 –29
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র–কাব্যে শারদীয়া দুর্গোৎসব : মেঘ ও রৌদ্রের মিলনমেলা

ড. সৌরভ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ
ইমেইল : saurabhmandal1987@gmail.com

Keyword
শারদীয়া, দুর্গোৎসব, ভাব-আন্দোলন, মানবতা, মিলনমেলা, উচ্ছ্বাস, অন্তরের চেতনা, চিরকালীন চিত্র।

Abstract
ষড়ঋতুর ঋতুর দেশ ভারতবর্ষ। আশ্বিনের নির্মল আকাশ, শিশির ভেজা শিউলি ফুল, প্রভাতের রৌদ্র, ঈষৎ শীতের সঞ্চার, দুর্গোৎসবের আনন্দে দেহ-মন শিউরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, স্মৃতিকথায় দুর্গাপূজাকে চিত্রিত করলেও ঈশ্বরকে গতানুগতিকতায় অনুসন্ধান করতে চাননি। তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা ও কর্মসাধনায় অনন্তের চৈতন্যই গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়েছেন, উচ্চ-অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল খেলা, তাতে কোন উদ্দেশ্য নেই, লাভও নেই, বাইরে থেকে দেখলে বৃথা সময় নষ্ট বলেই মনে হয়। কিন্তু দেশের সকলের মনের মধ্যে যদি ভাবের আন্দোলন হয়, একটা বড় উচ্ছ্বাস এনে দেয়, তা কখনো সামান্য হতে পারে না, নিষ্ফল হতে পারে না, নীরস বিষয়ীলোক, ধনী-দরিদ্র সকলের অন্তরেই এক আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে। এই ভাবের প্লাবনই মানবতার পথনির্দেশ করে।

Discussion
বাঙালি সমাজে নারীর জীবনে এক তীব্র কঠিন অন্তর বেদনাশ্রু নিহিত আছে, যা নারীকে একদিকে যেমন সম্মানের আসনে ঠাঁই দেয়, আবার অন্যদিকে ব্যাকুল করুণ দিকে নিপতিত করে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোই যেন সমাজের প্রচলিত রীতি। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে ফুটে ওঠে। আমাদের এই ঘরে স্নেহ, ঘরের দুঃখ, ঘরের অভিমান, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা থেকে অশ্রুসজল আকর্ষণ করে বাঙালি হৃদয়ের মাঝে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা শুধু বাঙালির আম্বিকাপুজো বা বাঙালির কন্যাপুজোয় নয়, আগমনী ও বিজয়ার বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। রবীদ্রনাথের ''ছেলেভুলানো ছড়া-১'' -এর মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানানভাবে প্রকাশ পেয়েছে–

> "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা

> লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অধিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।"[১]

মা অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন কন্যাটিকে, বাবা অর্থ দিয়ে মেয়ের সুখের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, মাসি ভাত খাইয়েছেন, পিসি দুধ খাইয়েছেন, ভাই বস্ত্র কিনে দিয়েছেন।এমন স্নেহময় পরিবারে আশা করাই যায় বোনও প্রিয়কাজ কিছু করে থাকবে। কিন্তু শেষ ছত্রটি পড়লে বুকে আঘাত হানে, চোখ ছলছল করে ওঠে। বোন সর্বদা তার সঙ্গে ঝগড়া করতো। অকথ্য গালিও দিত, বিদায়কালে তার বেদনা যেন সবচেয়ে সকরুণ।

হঠাৎ আজ যেন তার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল, সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সতীব্র অনুশোচনার সঙ্গে আজ তাকে বড় কঠিন আঘাত হানল। সে খাটের খুরা ধরে কাঁদতে লাগলো। বাল্যকালে এই একই খাটে তারা দুই ভগিনী একসঙ্গে শয়ন করত, এই শয়ন গৃহেই তাদের কলহ বিবাদ এবং সমস্ত খেলাধুলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়নকক্ষে এসে, সেই খাটের খুরা আঁকড়ে ধরে নির্জনে গোপনে দাঁড়িয়ে ব্যথিত বালিকা অশ্রুপাত করছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারায় কলহ ভাষার সমস্ত কলঙ্ক ধুয়ে মুছে শুভ্রতা প্রদান করেছে -

"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শশুরবাড়ি সংসার কাদায়ে॥
মা কাদেন, মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধক সাজায়ে॥
মাসি কাদেন, মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।।
পিসি কাঁদেন, পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই-যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সে-যে বোন— গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে।"[২]

"শিশু" কাব্যের 'পূজার সাজ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন পুজোর এক চিরকালীন চিত্র। পূজার সাজের আনন্দে বেদনায় কবি লিখেছেন –

"আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এলো কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু-হাত তুলে নাচে।"[৩]

পুজো উপলক্ষে গরীব পিতার দেওয়া পোশাক সম্পর্কে মধু ও বিধু দুই ভাইয়ের দুই বিপরীতধর্মী অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। বিধু বাবার দেওয়া ছিটের জামা, ধুতি এবং চাদরেই তৃপ্ত, অল্পতেই খুশি। কিন্তু মধুর এ পোশাক পছন্দসই নয়। তার নজর কেড়েছে রায়বাবুদের গুপির জরির কাজ করা টুপি আর ফুলকাটা সাটিনের জামার প্রতি। মধু রায়বাবুদের বাড়িতে যায় যেন তাদের কাছে দামি পোশাক ভিক্ষা মেলে। রায়বাবুরা তখন পুজোর দালান সাজাতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

"সেথা মেলা লোক জড়ো, রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো;
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।"[৪]

শেষ পর্যন্ত রায়বাবুর ছেলে গুপির সাটিনের জামা পেয়ে মধু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গর্বিত হয়ে সকলকে ডেকে ডেকে সাটিনের জামা দেখিয়েছে –

"বুক ফুলাইয়া চলে- সবারে ডাকিয়া বলে,
'দেখো কাকা! দেখো চেয়ে মামা!
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা'।"[৫]

মায়ের মনে বিধুর জন্যই রয়েছে বেশি আদর। কারণ দরিদ্র পিতা-মাতা আনন্দের সঙ্গে যে পোশাক এনে দিয়েছে তা সে আনন্দে বরণ করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় শুধু পুজোর চিত্রণ ও পুজোর পোশাক বর্ণনাই করেননি, ফুটিয়ে তুলেছেন ফুটিয়ে তুলেছেন দুই বিপরীতধর্মী শিশু চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে। এছাড়াও আমাদের চোখে পড়ে এক আদর্শ জননীর মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি। যেখানে মায়ের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়ে নিয়েছেন—

"আয় বিধু আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে,
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।"[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা (১৮৮৪) প্রকাশিত হয় দুর্গোৎসব নিয়ে। আনন্দময়ীর আগমন আনদের বার্তা বয়ে আনলেও দরিদ্র পরিবারের কাঙালিনী মেয়ে পথ চেয়ে বসে থাকে একমুঠে আনদের খোঁজ পেতে। কবি এই কবিতায় যেন সুখ-দুঃখের গল্প, আনদ-বেদনার গল্প, এক শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ের গল্প লিখতে চাইছেন। তা নিয়ে 'কড়ি ও কোমল' -এর 'কাঙালিনী' কবিতাটিতে আমরা দেখি এক দুঃখী মেয়ের করুণ কাহিনী –

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া

তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো,
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা –
ঝলকিছে কাঞ্চন – রতন,
কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।"[৭]

উৎসবের সময়ে সন্তানদের প্রতি অটুট ভালোবাসা রক্ষার্থে জননীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান –

"আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কি দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখে বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"[৮]

'শিশু' কাব্যে অন্তর্গত ছোটোবড়ো কবিতার মধ্য দিয়ে শিশুমনের কাল্পনিক রূপ ধরা পড়ে। পুজো মানে শিশুদের সীমাহীন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। দারিদ্রতাকে মেনে নিয়েই, শৈশব বয়সে মনকে শক্ত করে, নিজেকে নিজেই বুঝিয়ে নিয়ে, সহজ–সরলভাবে ত্যাগ করতে শিখে যায়। 'শিশু' কাব্যের 'বিদায়' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন -

"পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।
পুজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে'।
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সাধনা গতানুগতিকতায় সীমায়িত নয়। তাঁর সমগ্র ধ্যান ধারণা ও কর্মসাধনা অনন্তের চৈতন্যেই সামগ্রিক গুরুত্ব পায়। বলা যায়, রবীন্দ্র সাকার নয়, নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কর্মসাধনার মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করেছেন। ১৯০৩ সালে ২২শে অক্টোবর বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন –

> "সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাই না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহার-ই।"

এরও বছর দুয়েক পরে ১৯১২ সালের ১৮ই মার্চ আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন –

> "প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে একথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে।"

'ধর্ম' গ্রন্থের 'উৎসব' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই' এই সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" — ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—" বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে অমৃতময় আনন্দ, তাঁর প্রেম। মানবের মাঝেই আনন্দ, মিলনের মাঝেই প্রেম –

> "প্রাত্যহিক উদ্ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনী-দরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য – এই

সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।"[১০]

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার অবসর মেলে পুজোর ছুটিতে, দূরদেশে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। 'শিশু ভোলানাথে'র 'দূর' কবিতাটিতে সেই ছবি ধরা পড়ে –

"পুজোর ছুটি আসে যখন
বকসারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরই বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি।"[১১]

'পুনশ্চ' কাব্যের 'পয়লা আশ্বিন' কবিতাটিতে শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুজো প্রসঙ্গ এসেছে। কবি ভয়, লোভ, ক্ষোভ, লালসা সবকিছু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জেগে উঠতে বলেছেন –

"হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী ঊষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
... ...
ভয় কোরো না,লোভ কোরো না,ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন-
গান জাগিয়ে চলো সমুখ পথে
যেখানে ওই কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপ্‌নাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার

পরাজয়ের গ্লানিভরেমাথা তোমার নাহয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।"[১২]

আবার 'ছুটির আয়োজন' কবিতায় শরতকালীন প্রকৃতির বর্ণনা, পুজোর ছুটি উপলক্ষে উপন্যাস কেনার বর্ণনা, শাড়ি কেনার বর্ণনা, লাল মখমলের চটি কেনার বর্ণনা, অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই কেনার বর্ণনা, কোথায় ভ্রমণে যাবে সেই পরিকল্পনার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় –

"কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।
... ...
কলেজের ইকনমিক্‌স্‌-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল পাওয়া ছাত্র-
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্‌ দোকানে
'মনে রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায় জড়ানো শাঁখা,
দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না ।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায় –
এবার আবুপাহাড় না মাদুরা
না ড্যালহৌসি কিংবা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।"[১৩]

উক্ত কবিতাই ছাগ্‌-শিশুদের নিষ্ফল কান্না এবং তাদের বলিদান করে পুজোর আনন্দ সম্পূর্ণ হবার কথা রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন –

"আর দেখছি সামনে দিয়ে

স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা করে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন করে বুঝেছে তারা
এল তাদের পুজোর ছুটির দিন।"[১৪]

'কল্পনা' কাব্যের 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতায় দেবী দশভূজার পুজো উপলক্ষে দেবী নিজেই উহ্য থাকেন, সেখানে সাহেবী মানুষেরা ছাড়া অন্যান্যদের পূজামণ্ডপে ঢোকা নিষিদ্ধ, সেখানে পুজোর নামে চলে পশুহত্যা – তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনা করছেন –

"দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পুজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ –
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য?
কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মনুনিষিদ্ধ পক্ষী।
দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজাভবনের পূজ্য -
যাঁহাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে,
দেবী হয়ে গেছে উহ্য?

উত্তর
ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম।
এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে
অবমানে আঁখি রক্ত?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে
কুতূহলী দলে কি বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে?

ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা-জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য?
উত্তর
না না, এরা সবে ফিরিছে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে -
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর কলকাতা থেকে একটি চিঠিতে দুর্গোৎসবের সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি ভালোভাবে ভেবে দেখতে বলেছেন যে, উচ্চ-অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল-খেলা, তাতে সময় নষ্ট বলেই ধরে নিতে হয়। কিন্তু সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে যদি কোন ভাবের আন্দোলন তীব্র হয়, একটা উচ্ছ্বাস এনে দেয় তা চিরকালীন আনন্দ বলেই গণ্য হয় –

> "কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিলোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে সুরেশ সমাজপতির বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকত – কর মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেইবাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক'রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিষটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।"

নীলমণি ঠাকুরের কমলমণির গল্প থেকে আমরা জানতে পারি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথম দুর্গাপুজো খোলার ঘরে হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুজোর সমারোহ শুরু হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই। 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থের 'লিখি কিছু সাধ্য কী' কবিতার মধ্যে পুজোর সময় লেখালিখি নিয়ে একটু কৌতুক করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন –

"পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনের মতো কলমটা না ছোটাই –
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি।"[১৬]

জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'পার্বণী' নামক শারদীয় বার্ষিকীতে প্রথম পুজোর লেখা দেন। ১৩২৫ সালে প্রকাশিত 'পার্বণী' হল প্রথম বাংলা বার্ষিকী। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটজামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'পার্বণী'র প্রথম পূজাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ "শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে" গানটি 'শরতের গান' নাম দিয়ে লিখেছিলেন। এছাড়া 'ইচ্ছাপূরণ' গল্প ও 'ঠাকুরদার ছুটি' কবিতাও লিখেছিলেন।

পুজো সংখ্যায় লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে একশো টাকা বায়না দেওয়া হয় ১৯৩৫ সালে 'আনন্দবাজার'ও 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে। উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ২৯শে আগস্ট শান্তিনিকেতন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন –

> "এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই।"

'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের 'মিলনযাত্রা' কবিতাটিতেও তিনি ফ্ল্যাশব্যাকে পুজোর কিছু চিত্র উপহার দিয়েছেন –

"আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন।
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম.এ ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যাগে মেশে তারও লাগি পূজার সাজন।"[১৭]

'সোনারতরী" কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন –

"ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নি:ঝুম –
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।
গিয়েছে আশ্বিন,- পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে
সেই কর্মসংস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড-তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা।"[১৮]

বিদায়বেলার করুণ ছবি তাঁর কলমে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। গৃহিণীর চোখে জল, ভৃত্যদের তৎপরতা, চার বছরের কন্যার তার পিতার কাছে আবেদন 'যেতে নাহি দিব' কবিকে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। পুজো শেষ, শরতের শেষে ঘর থেকে কর্মস্থলে যাবার উদ্যোগ। মধ্য কার্তিকে বসে কবি লিখেছেন –

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে

সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন -'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।"[১৯]

এছাড়া 'শুকসারী' কবিতাতেও মহাদেব ও দেবী অন্নপূর্ণা প্রসঙ্গ আছে। 'কালের যাত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'কবির দীক্ষা' কবিতায়ও শিব ও অন্নপূর্ণা প্রসঙ্গ এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় নিজেকে 'শৈব' বলেও প্রকাশ করেছেন। আবার 'উৎসর্গ'-র ২৮ নম্বর ও ৪৫ নম্বর কবিতাতে হরগৌরী প্রসঙ্গ রয়েছে –

"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"[২০]

"পত্রপুট"-এর দুই-সংখ্যক কবিতায় পুজোর সময়কার প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে রয়েছে –

"শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।
কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না-
পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।"[২১]

'শৈশবসঙ্গীত' এর 'হরহৃদে কালিকা' কবিতায় দুর্গা অন্যরূপে অন্যভাবে আসীন, দুর্গার অন্যরূপ কালীর মায়ের বর্ণনাও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন –

"একদা প্রলয়শিঙা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা,
অমনি এ জগতের রাশরজ্জু টুটিবে।
আলোকসর্বস্ব হারা অন্ধ যত গ্রহ তারা।
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হ'তে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে!"[২২]

এছাড়াও, 'সহজপাঠ' গ্রন্থেও দুর্গাপুজোর আগমনী প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। "এসেছে শরৎ, হিমের পরশ লেগেছে হওয়ার পরে-" 'সহজপাঠ' গ্রন্থের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ পাঠের মধ্যে আমরা লক্ষ করি –

"যেদিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি-যে ছুটির ছবি,
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।"[২৩]

আবার, 'সহজপাঠে'র দ্বিতীয় ভাগের ত্রয়োদশ পাঠে আশ্বিনের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্ধের আগমনী গানের সন্ধান পায় –

"আশ্বিনে হাট বসে ভারি ধুম ক'রে,
মহাজনী নৌকায় ঘাট যায় ভ'রে-
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি মহা সোরগোল,
পশ্চিমী মাল্লারা বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায় দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে।।"[২৪]

দুর্গাপুজোকে ঘিরে, পুজোর ছুটিকে ঘিরে, ঘরে ফেরা ও প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে, শরতের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলাকে ঘিরে, মানুষের মনের আকাশেও আলো-আঁধারির কি বিচিত্র খেলা তা আমরা রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে দিয়ে খুঁজে পায়। এই দশভুজা, দুর্গাতেই নানাভাবে শরৎকালে আমরা প্রাণভরে ভক্তি-বিশ্বাস-শ্রদ্ধায় আরাধনা করে থাকি প্রতিবছর সর্বজনীনভাবে। তাই দুর্গাপুজো উৎসবটি সকল ধর্মের মিলনমেলা।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩,

কলকাতা, পৃ. ১০০৩ - ১০০৪
২. তদেব, পৃ. ১০০৪
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৫৭
৪. তদেব, পৃ. ৫৭
৫. তদেব, পৃ. ৫৮
৬. তদেব, পৃ. ৫৮
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১৫৫
৮. তদেব, পৃ. ১৫৭
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৪৩
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৭১৩
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা –২০০৩, কলকাতা, পৃ. ২৮৯
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা -২০০৩, কলকাতা, পৃ. ২২৮
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা -২০০৩, কলকাতা, পৃ. ২১৪
১৪. তদেব, পৃ. ২১৫
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৪৩৭ - ৪৩৮
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ২২৩
১৭. তদেব, পৃ. ৫৫
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৪৬
১৯. তদেব, পৃ. ৪৮
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১১৩-১১৪
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৯৭
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১২১
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১০২২
২৪. তদেব, পৃ. ১০৪০